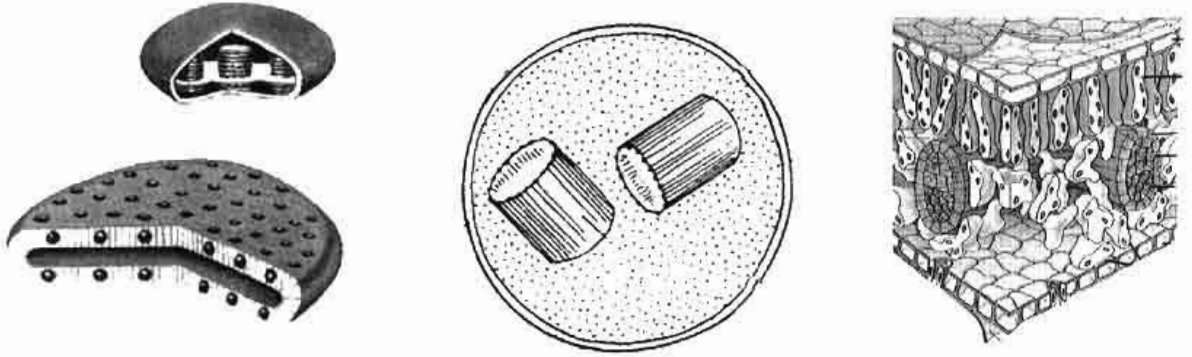


দ্বিতীয় অধ্যায় জীবকোষ ও টিস্যু

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ। এসব ধারণার উপর ভিত্তি করে তোমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি জীবকোষ আর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ঐ একই জীবকোষের গঠন কি এক রকম?

এ অধ্যায়ে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা কোষ ও টিস্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের তুলনা করতে পারব।
- স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ সুদৃষ্টভাবে সম্পাদনে বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদ দেহে কোষের উপবোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব।
- উদ্ভিদ টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণী টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- একই রকম কোষ সমষ্টির ও একই কাজ সম্পন্ন করার ভিত্তিতে টিস্যুর কাজ মূল্যায়ন করতে পারব।
- টিস্যু, অঙ্গ এবং তন্ত্রে কোষের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষ পর্যবেক্ষণ করে চিত্রিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- সঠিকভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারব।
- জীবের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে, কোষ জীবদেহের একক। একটি ইমারত যেমন হাজার হাজার ইট দিয়ে তৈরি হয় সেভাবে একটি জীবদেহ লক্ষ লক্ষ জীবকোষ দ্বারা গঠিত হয়। এই জীবকোষ কী? কোনো কোনো বিজ্ঞানী জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লোয়ী (Loey) এবং সিকেভিৎজ (Sievevitz) ১৯৬৯ সালে বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দ্বারা আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ব্যতিরেকেই নিজের প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে সক্ষম তাকে কোষ বলেছেন।

কোষের প্রকারভেদ

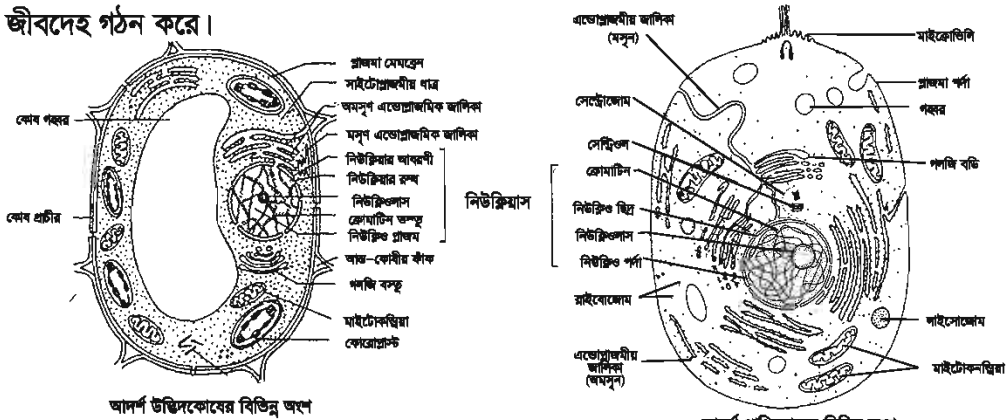
নিউক্লিয়াসের সংগঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের যথা— আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ।

ক) আদি কোষ (Prokaryotic cell) : এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না। এ জন্য এদের আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়। এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে না। ফলে নিউক্লিয়াসস্থ সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্রাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে না তবে রাইবোজোম উপস্থিত থাকে। ক্রোমোজোমে কেবল DNA অথবা RNA থাকে, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ব্যাকটেরিয়ায় এ ধরনের কোষ থাকে।

খ) প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) : এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লী (nuclear membrane) দ্বারা নিউক্লিওবস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত। ক্রোমোজোমে DNA প্রোটিন, হিস্টোন ও অন্যান্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ জীবকোষ এ ধরনের হয়। শৈবাল থেকে শুরু করে সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং অ্যামিবা থেকে উন্নত প্রাণীর দেহেও এ ধরনের কোষ থাকে। এসব কোষে রাইবোজোম ছাড়া অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে।

কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই প্রকার, যথা— দেহ কোষ ও জনন কোষ।

- দেহ কোষ (Somatic cell) :** বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে। মাইটোটিক ও এমাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে কোষ বিভাজিত হয়। এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহ কোষ অংশ নেয়।
- জনন কোষ (Gametic cell) :** যৌন প্রজনন ও জনুক্রম দেখা যায় এমন জীবে জনন কোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়। জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহ কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। মাতৃ ও পিতৃ জনন কোষ মিলিত হয়ে নতুন জীবের দেহ গঠনের সূচনা করে। এ প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে। জাইগোট বার বার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।

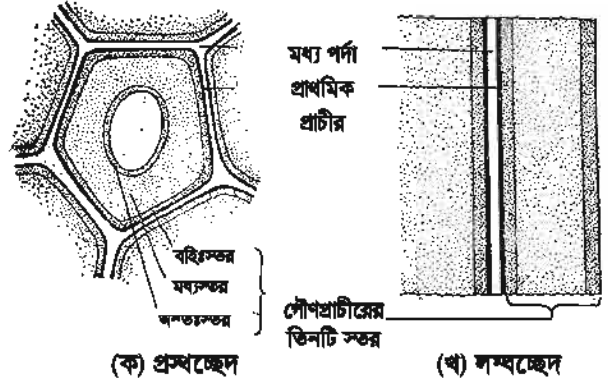


চিত্র-২.১: উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কিছু কোষঅঙ্গাণুর কাজের সাথে এবার আমরা পরিচিত হব।

ক) কোষ প্রাচীর (Cell wall) : কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি মৃত বা জড়বস্তু দ্বারা গঠিত। এর রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এতে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন ও লিপিড দ্বারা গঠিত।

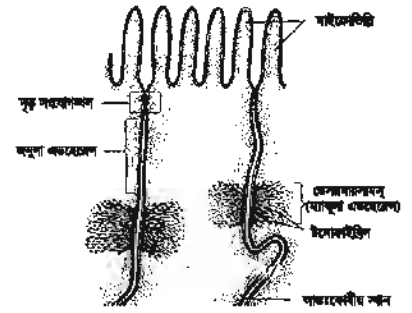


চিত্র-২.২: কোষ প্রাচীরের আণুবীক্ষণিক চিত্র।

প্রাথমিক কোষপ্রাচীরটি একস্তর বিশিষ্ট। মধ্য

পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত কয়েক প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য জমে ক্রমশ গৌণ প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাচীর গঠনকালে মাঝে মাঝে ছিদ্র তৈরি হয়, যাকে কূপ বলে। কোষ প্রাচীর কোষকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে। কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পার্শ্ববর্তী কোষের সাথে প্লাজমোডেজমাটা সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। পানি ও খনিজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণীকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না।

খ) কোষঝিল্লী (Plasmalemma): প্রোটোপ্লাজমের বাইরে যে দ্বিস্তরবিশিষ্ট পর্দা থাকে তাকে কোষঝিল্লী বা প্লাজমালেমা বলে। উদ্ভিদকোষে কোষপ্রাচীরের সাথে লাগানো কোষের অভ্যন্তরে এর অবস্থান। এটি দুইস্তর বিশিষ্ট একটি স্থিতিস্থাপক পর্দা। কোষঝিল্লীর ভাঁজকে মাইক্রোভিল্লি বলে। এটি প্রধানত লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। কোষঝিল্লী একটি বৈষম্য ভেদ্য পর্দা হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি ও খনিজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ও পার্শ্ববর্তী কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখে।

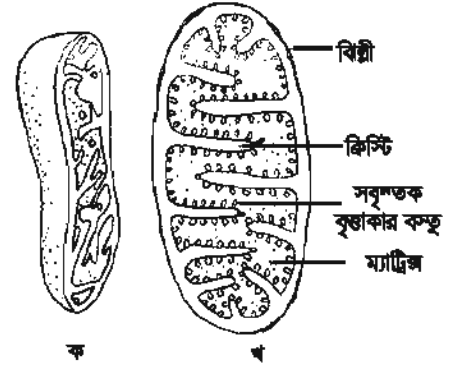


চিত্র-২.৩: দ্বিস্তর বিশিষ্ট কোষঝিল্লী।

গ) সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণু : সাইটোপ্লাজম কি তা তোমরা নিচের শ্রেণিতে জেনেছ। কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির ন্যায় বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষঝিল্লী দ্বারা ঘেরা সমুদয় বস্তুই প্রোটোপ্লাজম। এ প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলি সদৃশ বস্তুটি থেকে যায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা। এবার দেখা যাক এসব অঙ্গাণুর কাজ কী কী।

১) মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria): শ্বসনে অংশগ্রহণকারী এ অঙ্গাণুটি বেনডা (Benda) ১৮৯৮ সালে আবিষ্কার করেন। এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণী বা ঝিল্লী দিয়ে ঘেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃত্তাকার গোলাকার বস্তু থাকে, একে অক্সিজোম (oxisome) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচকগুলো সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়নের ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)।

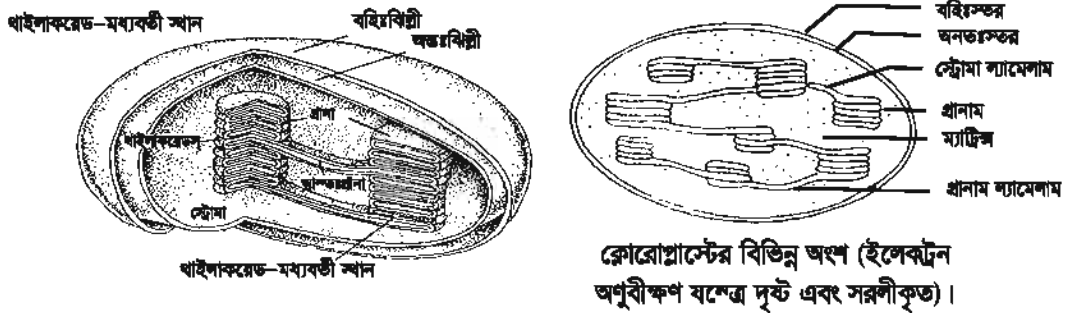
জীবের শ্বসনকার্যে সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ। তোমরা জেনেছ যে শ্বসন ক্রিয়ার প্রধান ধাপ দুটি। এর প্রথম ধাপ গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে না। তবে দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো এ অঙ্গাণুর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। ক্রেবস চক্রে অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক এতে উপস্থিত থাকায় এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়। ক্রেবস চক্রে সর্বাধিক শক্তি উৎপাদিত হয়। এ জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস বলা হয়। এ শক্তি জীব তার বিভিন্ন কাজে খরচ করে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়।



চিত্র ২.৪: মাইটোকন্ড্রিয়া, ক, খ-লম্বচ্ছেদ

২। **গ্রান্টিড (Plastids) :** গ্রান্টিড উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। গ্রান্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সংরক্ষণ করা ও উদ্ভিদ দেহকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা। গ্রান্টিড তিন ধরনের যথা—ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।

ক) **ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) :** সবুজ রঙের গ্রান্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কান্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। গ্রান্টিডের গ্রানা (grana) অংশ সূর্যালোককে আবশ্ব করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই আবশ্ব সৌরশক্তি স্টোমা (stoma)-তে অবস্থিত উৎসেচক সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি থেকে সরল শর্করা উৎপন্ন করে। এই গ্রান্টিডে ক্লোরোফিল থাকে তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জকও থাকে।



ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট এবং সরলীকৃত)।

চিত্র: ২.৫: একটি গ্রান্টিড কণা (খন্ডিত)।

খ) **ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplasts) :** এরা রঙিন গ্রান্টিড তবে এরা সবুজ নয়। এসব গ্রান্টিড জ্যান্থফিল, ক্যারোটিন, ফাইকোএরিথ্রিন, ফাইকোসায়ানিন ইত্যাদি বর্ণের কণিকা ধারণ করে তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল, পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙিন ফুল, পাতা ও গাছের মূলে এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ সংগ্রহণ ও জমা করে।

গ) **লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) :** যেসব গ্রান্টিড কোনো রঞ্জক পদার্থ ধারণ করে না তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যে সব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেখানে এদের পাওয়া যায়, যেমন—মূল, ত্রুণ, জনন কোষ ইত্যাদি।

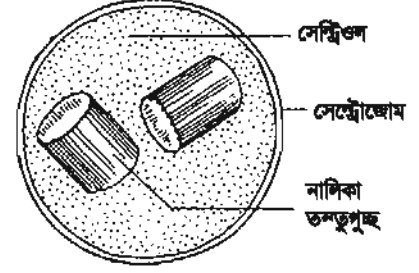
এদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট বা ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

কাজ : প্রস্টিডের চিত্র অংকন।

উপকরণ : বিভিন্ন রকমের প্রস্টিডের চিত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন।

বিভিন্ন রকমের প্রস্টিডের চিত্র অংকন করে বোর্ডে ঝুলিয়ে দাও ও শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

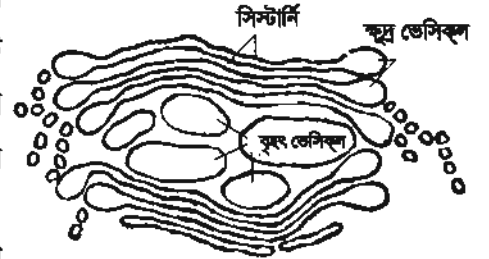
- ৩। **সেন্ট্রিওল :** প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি কাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে, সেন্ট্রিওল সাধারণত একটি স্বচ্ছ দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম দ্বারা আবৃত থাকে। এ এলাকাকে সেন্ট্রোজোম বলে। উদ্ভিদকোষে সেন্ট্রিওল সাধারণত থাকে না। তবে নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদকোষে যেমন—ছত্রাকে থাকে। প্রাণিকোষ বিভাজনের সময় এন্টার-রে গঠন করা সেন্ট্রিওলের প্রধান কাজ।



চিত্র ২.৬ : সেন্ট্রিওল

- ৪। **রাইবোজোম (Ribosome) :** প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় প্রকার কোষেই এদের পাওয়া যায়। এই পদার্থবিহীন অঙ্গাণুটি প্রধানত আমিষ সংশ্লেষণে সাহায্য করে। কোষীয় আমিষ সংশ্লেষণ হবে তার স্থান নির্ধারণ করা এর কাজ। প্রোটিনের পলিপেপটাইডচেইন সংযোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে। এছাড়া এ কাজে প্রয়োজনীয় উৎসেচক সরবরাহ করে থাকে।

- ৫। **গলজি বস্তু (Golgi body) :** গলজি বস্তু প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়। তবে বহু উদ্ভিদ কোষেও এদের দেখা যায়। এটি সিসটার্নি ও কয়েক প্রকার ভেসিকল নিয়ে গঠিত। এর পর্দায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিয়োজন সম্পন্ন হয়। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হরমোন নিঃসরণেও এর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বিপাকীয় কার্যের সাথে এরা সম্পর্কিত। কখনও কখনও এরা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে।



চিত্র:২.৭: একটি গলজি বস্তু

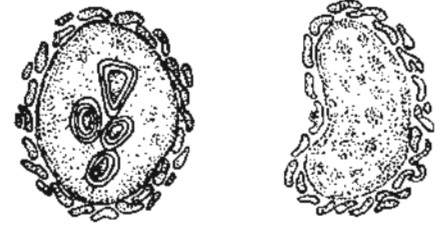
- ৬। **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum) :** এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর আবরণীর গায়ে প্রায়ই রাইবোজোম লেগে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই সব স্থানে আমিষ সংশ্লেষণের ঘটনা ঘটে। কোষে উৎপাদিত পদার্থসমূহের প্রবাহ পথ হিসেবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়। এরা কখনও প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে, তাই ধারণা করা হয় যে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোষে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রব্যাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে। মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর ইত্যাদি সৃষ্টিতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।

- ৭। **সেন্ট্রোজোম (Centrosome) :** এটি প্রাণিকোষের বৈশিষ্ট্য। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ কোষে কদাচিৎ এদের দেখা যায়। সেন্ট্রোজোমে বিদ্যমান সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় এন্টার রে উৎপাদন করে। এছাড়া স্পিন্ডল যন্ত্র

সৃষ্টিতেও এর অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ক্লাজেনা সৃষ্টিতে এরা অংশগ্রহণ করে। প্রধানত প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়।

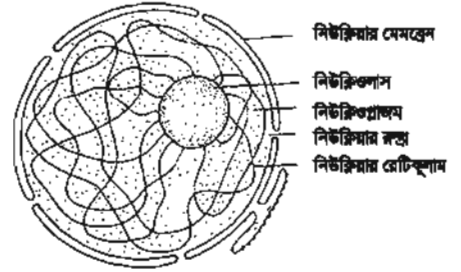
- ৮। কোষ গহ্বর (Vacuole) : বৃহৎ কোষ গহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কাজ কোষরস ধারণ করা। বিভিন্ন প্রকার অজৈব লবণ, আমিষ, শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ, জৈব এসিড, রঞ্জক পদার্থ, পানি ইত্যাদি এই কোষরসে থাকে। প্রাণিকোষে কোষ গহ্বর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, তবে যদি কখনও থাকে তবে তা আকারে ছোট হয়।

- ৯। লাইসোজোম (Lysosome): লাইসোজোম জীব কোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর উৎসেচক আগত জীবাণুগুলোকে হজম করে ফেলে। এর পরিপাক উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দ্বারা আলাদা করা থাকে তাই অন্যান্য কোষ এর সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না। দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে লাইসোজোমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর সাথে লাগানো কোষগুলোর মৃত্যু ঘটে।



চিত্র-২.৮: লাইসোজোম কণা।

- ১০। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus) : কোষের সব জৈবনিক ক্রিয়া বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিয়াস। এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিন্থকোষ ও লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। এটি কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলীসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত কেন্দ্রিকায় নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

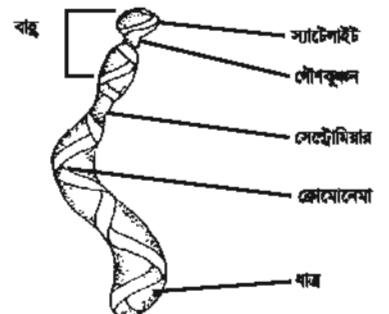


চিত্র-২.৯: লাইসোজোম কণা।

- ক) নিউক্লিয়ার ঝিল্লী (Nuclear membrane) : নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে যে ঝিল্লী তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লী বা কেন্দ্রিকা ঝিল্লী বলে। এটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট ঝিল্লী। এ ঝিল্লী লিপিড ও প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। এ ঝিল্লীতে মাঝে মাঝে কিছু ছিদ্র থাকে একে নিউক্লিয়ার রস্ট্র বলে। এই ছিদ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রিকা ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। এই ঝিল্লী সাইটোপ্লাজম থেকে কেন্দ্রিকার অন্যান্য বস্তুকে পৃথক করে ও বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

- খ) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm) : কেন্দ্রিকা ঝিল্লীর অভ্যন্তরে জেলির ন্যায় বস্তু বা রসকে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। কেন্দ্রিকারসে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

- গ) নিউক্লিওলাস (Nucleolus) : কেন্দ্রিকারসের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে লাগানো গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রঙঅগ্রহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এরা নিউক্লিক এসিড মজুদ করে ও প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।



চিত্র-২.১০: একটি ক্রোমোজোম।

ঘ) **ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum) :** কোষের বিশ্রামকালে কেন্দ্রিকায় কুন্ডলী পাকানো সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় অংশই ক্রোমাটিন জালিকা। কোষ বিভাজনের সময় এরা মোটা ও খাটো হয় তাই তখন তাদের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোম হিসেবে দেখা যায়। ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো বংশগতির গুণাবলী বহন করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নিয়ে যায়। কোনো একটি জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা ঐ জীবের জন্য নির্দিষ্ট। এসব ক্রোমোজোমে বংশধারা বহনকারী জিন (gene) অবস্থান করে। পুরুষানুক্রমে বংশের বৈশিষ্ট্য বহন করা ক্রোমোজোমের কাজ।

মানবদেহের স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা কোষ প্রাণী দেহের একক। এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীদের কোষের কাজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হয়। আদি পৃথিবীর প্রাণের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়া পর্বের প্রজাতিগুলো তাদের দেহের সব ধরনের ক্রিয়াকলাপ যেমন খাদ্যগ্রহণ, দেহের বৃদ্ধি ও প্রজনন ঐ এক কোষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহকোষের মাঝে ভিন্নতা আছে, আছে বৈচিত্র্যতা।

মানব দেহে নানা ধরনের কোষ আছে যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত। মানব দেহের স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতন ছড়িয়ে থাকে। দেহের যে কোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানব চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন দেখতে সক্ষম হয় না। অনেক প্রাণী শুধু দিনে অথবা রাতে দেখতে পায়। আমাদের কাজকর্মে, হাটাচলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের রক্তকোষ মানবদেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধর্মণির মাধ্যমে কৈশিক নালি হয়ে দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অনুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার ত্বকীয় কোষ থেকে চুল গজিয়ে থাকে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নির্গমন কোষ থেকে ঘাম নির্গত করে। অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ টিস্যু (Plant tissue)

একই গঠনবিশিষ্ট একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি অভিন্ন হয় তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে। টিস্যু দুই ধরনের যথা- ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যু বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যু বিভাজিত হতে পারে না। স্থায়ী টিস্যু দুই প্রকার, যথা- সরল টিস্যু ও জটিল টিস্যু।

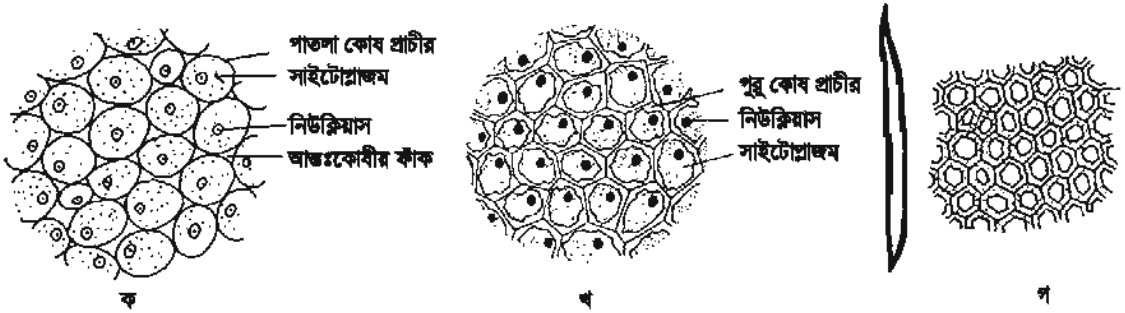
সরল টিস্যু (Simple tissue) : যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিন্ন তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা- ১) প্যারেনকাইমা, ২) কোলেনকাইমা ও ৩) স্ক্লেরেনকাইমা।

১) **প্যারেনকাইমা (parenchyma) :** উদ্ভিদ দেহের সব অংশে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, সমব্যসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত ও প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়।

কোষপ্রাচীর পাতলা ও সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তখন তাকে ক্লোরেনকাইমা (chlorenchyma) বলে। জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ুকুঠুরীযুক্ত প্যারেনকাইমাকে এ্যারেনকাইমা (aerenchyma) বলে। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহন করা।

- ২) কোলেনকাইমা (collenchyma) : এরা বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ ও পেকটিন জমে পুরু হয়। তবে এদের কোষের প্রাচীর অসমভাবে পুরু এবং কোণগুলো অধিক পুরু হয়। এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও সজীব। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দ্বারা গঠিত। এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষপ্রান্ত চৌকোশাকার, সরু বা তীর্যক হতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত ও উদ্ভিদ দেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। পাতার শিরা, পত্রবৃন্তে এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কাষ্ঠ, যেমন কুমড়া ও দস্তকলসীর কাণ্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে। এ কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।



চিত্র-২.১১: বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু, ক- প্যারেনকাইমা, খ-কোলেনকাইমা, গ- স্ক্লেরেনকাইমা।

- ৩) স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) : এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা ও পুরু প্রাচীর বিশিষ্ট হয়। প্রোটোপ্লাজমবিহীন, লিগনিনযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দ্বারা গঠিত টিস্যুকে স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু বলে। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়। কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, যথা- ফাইবার ও স্ক্লেরাইড। উদ্ভিদ দেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন করা এর মূল কাজ।

- ক) ফাইবার বা তন্তু (Fibre) : এরা অত্যন্ত দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত এবং দুই প্রান্ত সরু। তবে কখনো তৌতা হতে পারে। প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র থাকে। এ ছিদ্রকে কুপ বলে। অবস্থান ও গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যথা- বাস্ট ফাইবার, সার্ফেস ফাইবার, জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠতন্তু।

- খ) স্ক্লেরাইড (Sclereids) : এদেরকে স্টোন সেলও বলা হয়। এরা খাটো, সমবাসী, কখনও লম্বাটে আবার কখনও তারাকাকার হতে পারে। এদের গৌণপ্রাচীর খুবই শক্ত, অত্যন্ত পুরু ও লিগনিনযুক্ত। পরিণত স্ক্লেরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে। কোষপ্রাচীর কুপযুক্ত হয়।

নগ্নবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কর্টেক্স, ফল ও বীজত্বকে স্ক্লেরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিঃত্বক জাইলেম ও ফ্লোয়েমের সাথে একত্রে পত্রবৃন্তে কোষগুচ্ছরূপে থাকতে পারে।

কাজ : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিত্র অংকন।

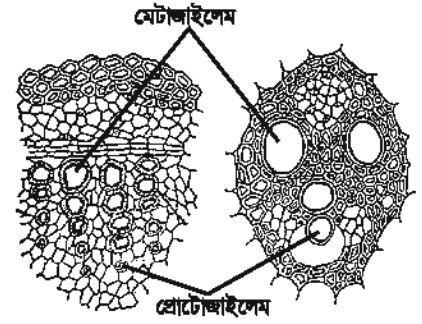
উপকরণ : পোস্টার পেপার ও সাইনপেন

তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিহ্নিত চিত্র আঁক এবং এদের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন কর।

জটিল টিস্যু (Complex tissues)

বিভিন্ন প্রকারের কোষ সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু গঠিত হয় তাকে জটিল টিস্যু বলে। এরা উদ্ভিদে পরিবহনের কাজ করে, তাই এদের পরিবহন টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের, যথা- জাইলেম ও ফ্লোয়েম। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

জাইলেম (Xylem) : জাইলেম দুই ধরনের- প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম। প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃদ্ধি শেষে যেসব ক্ষেত্রে গৌণবৃদ্ধি ঘটে সেখানে গৌণ জাইলেম সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের। প্রাথমিক অবস্থায় একে প্রোটোজাইলেম এবং পরিণত অবস্থায় মেটা জাইলেম বলে। মেটা জাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরটি বড় থাকে।

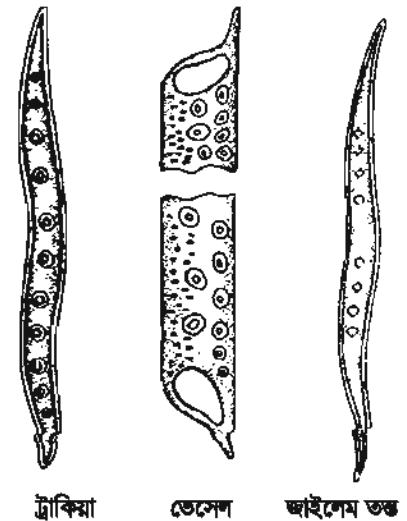


চিত্র-২.১২: একটি পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ।

জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন- ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।

ক) **ট্রাকিড (Tracheids) :** ট্রাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তদ্বয় সরু ও সূঁচালো। প্রাচীরে লিগনিন জমে পুরু হয়ে অভ্যন্তরীণ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানির চলাচল পার্শ্বীয় জোড়া কুপ (paired pits) এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব কয়েক ধরনের হয়, যেমন- বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার ও কুপাক্রিত। ফার্নবর্গ, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও গৌণ জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়। কোষ রসের পরিবহন অজ্ঞাকে দৃঢ়তা প্রদান প্রধান কাজ। তবে কখনও খাদ্য সঞ্চয়ের কাজও এ টিস্যু করে থাকে।

খ) **ভেসেল (Vessels) :** ভেসেল কোষগুলো খাটো চোঙের ন্যায়। কোষগুলো একটির মাথায় একটি সজ্জিত হয়ে এবং প্রান্তীয় প্রাচীর গলে একটি দীর্ঘ নলের ন্যায় অজ্ঞের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষরসের উর্ধ্বারোহণের জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিণত বয়সে এরা মৃত ও প্রোটোপ্লাজমবিহীন। ভেসেলের প্রাচীর ট্রাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন- সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কুপাক্রিত ইত্যাদি। ভেসেল সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। তবে বৃক্ষ বা আরোহী উদ্ভিদ আরও অধিক লম্বা হতে পারে। এদের প্রধানত গুস্তবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ, যেমন- নিটামে (*Gnetum*) প্রাথমিক



চিত্র-২.১৩: বিভিন্ন ধরনের জাইলেম

পর্যায়ের ভেসেল থাকে। পানি ও খনিজ পরিবহনে এবং অজ্ঞাকে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

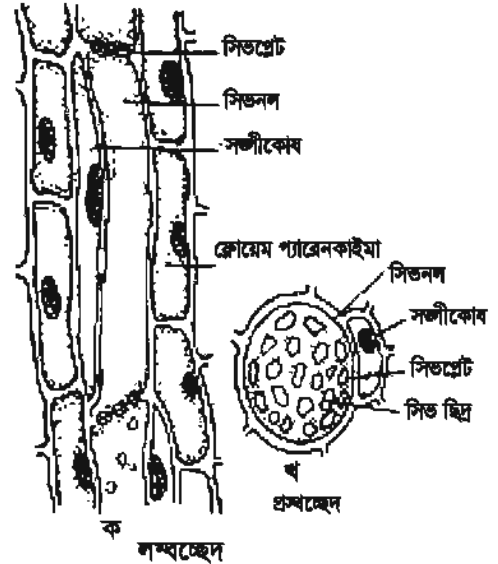
গ) **জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma)** : জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উড প্যারেনকাইমা (wood parenchyma) বলে। এদের প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত। তবে গৌণ জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য সংরক্ষণ ও পানি পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।

ঘ) **জাইলেম ফাইবার (Xylem fibre)** : জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই জাইলেম ফাইবার। এদের উড ফাইবারও বলে। এ কোষগুলো লম্বা। এদের দু'প্রান্ত সরু। পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উদ্ভিদে এরা যান্ত্রিক শক্তি যোগায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে। পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহন, খাদ্য সংরক্ষণ, উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।

ফ্লোয়েম (Phloem) : এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ গঠন করে। সীতনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত হয়।

জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে তেমনি ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করে।

ক) **সিভকোষ (Sieve cell)** : এরা বিশেষ ধরনের কোষ। দীর্ঘ, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত ও জীবিত এ কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর একটি পরপর সজ্জিত হয়ে সিভনল (Sieve tube) গঠন করে। এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত সিভপ্রেট দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর ঘেঁষে থাকে ফলে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়, যা খাদ্য পরিবহনে নল হিসেবে কাজ করে। এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত। পরিণত সিভকোষে কোনো কেন্দ্রিকা থাকে না। সকল প্রকার গুল্মবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সিভকোষ ও সিভনল উপস্থিত থাকে। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করা এদের প্রধান কাজ।



চিত্র-২.১৪: ফ্লোয়েম টিস্যু।

খ) **সঙ্গীকোষ (Companion cell)** : প্রতিটি সিভকোষের সাথে প্যারেনকাইমা জাতীয় একটি করে কোষ অবস্থান করে। এদের কেন্দ্রিকা বেশ বড়। ধারণা করা হয় যে, এই কেন্দ্রিকা সিভকোষের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কোষ প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত। ফার্ন ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে এদের উপস্থিতি নেই।

গ) **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchyma)** : ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এরা

খাদ্য সংরক্ষণ করে ও খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করে। একবীজপত্রী উদ্ভিদ ব্যতীত দ্বিবীজপত্রী, আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী এবং ফার্ন উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে এদের পাওয়া যায়।

- ঘ) ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre) : স্ক্লেরেনকাইমা কোষ সমন্বয়ে ফ্লোয়েম ফাইবার গঠিত হয়। এগুলো একপ্রকার দীর্ঘ কোষ যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ এক ধরনের বাস্ট ফাইবার। উদ্ভিদ অঙ্গের গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়। এসব কোষের প্রাচীরে কুপ দেখা যায়। ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা ও মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে-নিচে পরিবাহিত হয়।

প্রাণিটিস্যুর কাজ

বহুকোষী প্রাণী দেহে অনেক কোষ একত্রে কোন বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। একই ভূমিকার কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে। একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। কোষ ও টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক। যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। এদের একত্রে তরল যোজক টিস্যু বলা হয়। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

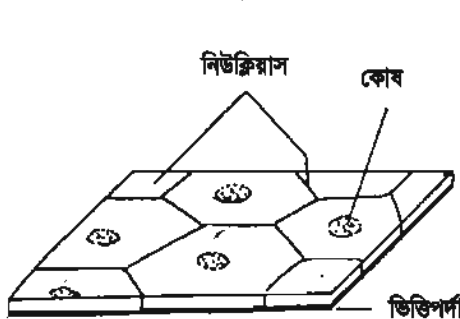
প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ

প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়। নিচে প্রকারসহ বিভিন্ন টিস্যুর কাজের বর্ণনা দেওয়া হলো।

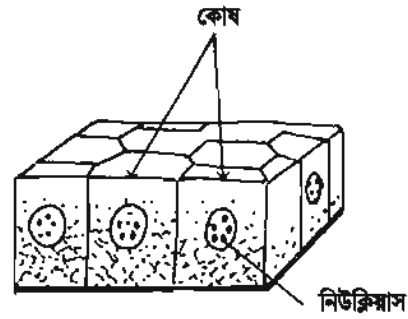
১. আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে অবস্থান ও কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যথা:

- ক. স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা ও নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়।
উদাহরণ: বৃকের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। প্রধানত আবরণ ছাড়াও হাঁকন কাজে লিপ্ত থাকে।
- খ. কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় সমান। উদাহরণ: বৃকের সংগ্রাহক নালিকা। প্রধানত পরিশোধন এবং আবরণ কাজে লিপ্ত।



চিত্র ২.১৫ : স্কোয়ামাস (আঁশাকার) আবরণী টিস্যু

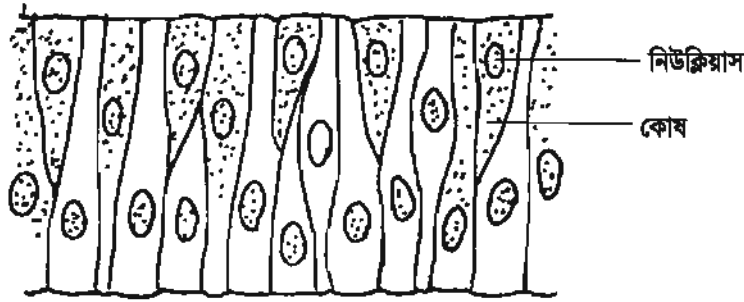


চিত্র ২.১৬ : কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু



চিত্র ২.১৭ : কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু

চিত্র ২.১৮ : স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু



চিত্র ২.১৯ : সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

গ. কলামনার আবরণী টিস্যু : এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু ও লম্বা। উদাহরণ: প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো প্রাথমিক ক্ষরণ, রক্ষণ ও শোষণ কাজে লিপ্ত। প্রাণী দেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

i. সাধারণ আবরণী টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ একস্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যানস ক্যাপসুল, বৃক্কীয় নালিকা, অত্র প্রাচীর।

ii. স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু : ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক।

iii. সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু : এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর একস্তরে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। উদাহরণ ট্রাকিয়া। আবরণী টিস্যু কোষগুলো বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন—

১. সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু— মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালির প্রাচীরে দেখা যায়।

২. ফ্লাজেলাযুক্ত আবরণী টিস্যু— হাইড্রার এন্ডোডার্মে থাকে।

৩. ক্ষণপদযুক্ত আবরণী টিস্যু— হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে দেখা যায়।

৪. জননকোষের আবরণী টিস্যু— বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু যা থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন হয়।

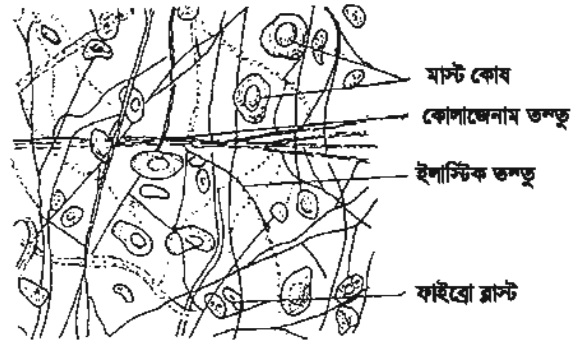
দেখা যাচ্ছে যে আবরণী টিস্যু কোনো অঙ্গের বা নালির ভিতরের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহন ইত্যাদি কাজে অংশ নেয়। আবরণী টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জনন টিস্যুতে পরিণত হয়ে দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

২. যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা—

ক. ফাইব্রাস যোজক টিস্যু : এই ধরনের যোজক টিস্যু দেহত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

খ. স্কেলিটাল যোজক টিস্যু : দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গা সঞ্চালন ও চলনে সহায়তা করে। দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গসমূহকে যেমন— মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জুকর্ড, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিসমূহের সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দু'ধরনের হয়। যেমন— কোমলাস্থি ও অস্থি। কোমলাস্থি (Cartilage) এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাকের ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।



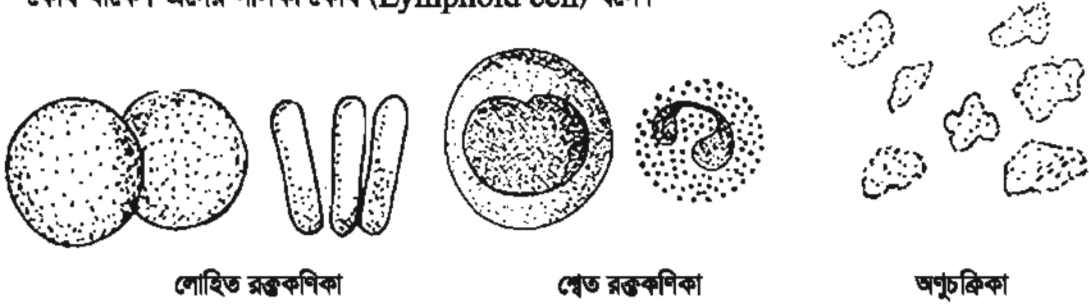
চিত্র ২.২০ : কানেকটিভ টিস্যু

অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভজ্জুর এবং অনমনীয় স্কেলিটন কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।

গ. তরল আবরণী টিস্যু (Fluid connective tissue) : তরল আবরণী টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহন করা, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা।

রক্ত এক ধরনের ক্ষরীয়, ঈষৎ লবণাক্ত, লালবর্ণের তরল আবরণী টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয়। উষ্ণরক্তবাহী প্রাণীর দেহে রক্ত তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। রক্তের উপাদান দুটি, যথা— রক্তরস ও রক্তকণিকা। রক্তরস (Plasma) রক্তের তরল অংশ। এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় ৯১-৯২% অংশ পানি এবং ৮-৯% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব রক্তরসের ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন ও বর্জ্য পদার্থ থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা— লোহিত রক্তকণিকা (Erythrocyte বা Red blood corpuscles), শ্বেত রক্তকণিকা (Leucocyte or white blood corpuscle) ও অনুচক্রিকা (Thrombocytes Blood platelet)। লোহিত রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহন করে। শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েকধরনের শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধায় অংশ নেয়। মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Inter cellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় সেগুলো কতগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি স্বতন্ত্র নালিকাতন্ত্র গঠন করে,

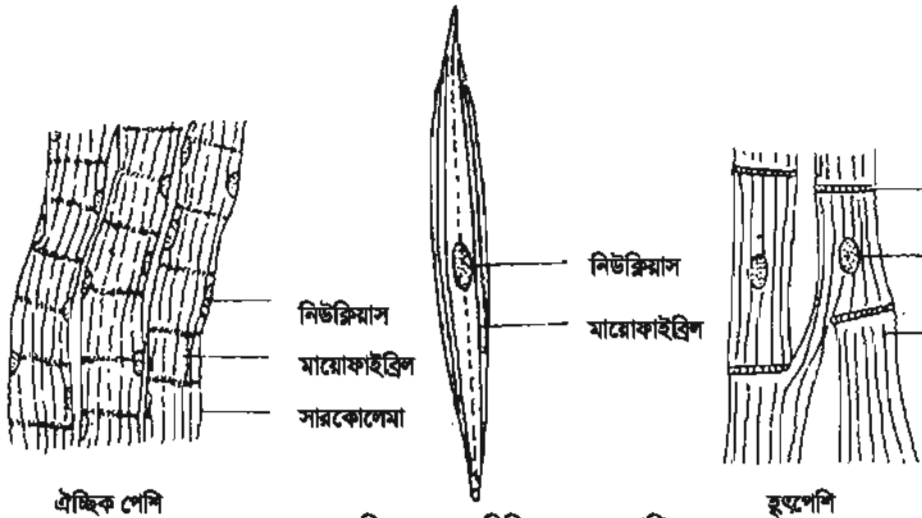
যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymph system) বলে। টনসিল লসিকাতন্ত্রের অংশ। লসিকার মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে। এদের লসিকা কোষ (Lymphoid cell) বলে।



চিত্র ২.২১ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা

৩. পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

দ্রুণ মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন প্রসারণশীল বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশি কোষগুলো সরু, লম্বা ও তন্তুত্ময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরা কাঁটা থাকে তাদের ডোরাকাটা পেশি (Straited muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণপেশি (Smooth muscle) বলে। পেশি কোষ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন ঘটে। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, যথা— ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি ও হৃদ পেশি। ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশি টিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরায়ুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকোচিত ও প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রে সংলগ্ন থাকে। উদাহরণ—মানুষের পায়ের পেশি।



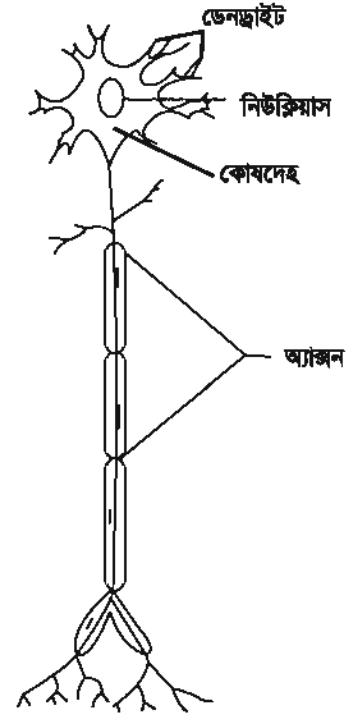
চিত্র ২.২২ : বিভিন্ন ধরনের পেশি

অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাবিহীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন খাদ্য হضم প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন। কার্ডিয়াক পেশি বা হৃদপেশি (Cardiac muscle) মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক

পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশি গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। মানব তৃণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।

৪. স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ু কোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত। এর গঠন সম্পর্কে তোমরা দশম অধ্যায়ে জানতে পারবে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে দেহের ভিতরে মস্তিষ্কে পরিবাহিত করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করে থাকে। একটি আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে, যথা— অ্যাক্সন, ডেনড্রাইট ও কোষদেহ। নিউরন কোষদেহ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে, তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিউরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি গঠন হয় তাকে সিনাপস (Synaps) বলে। সিনাপস এর মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটিস্যু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয় এবং তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ু টিস্যু মস্তিষ্কে স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করা সহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

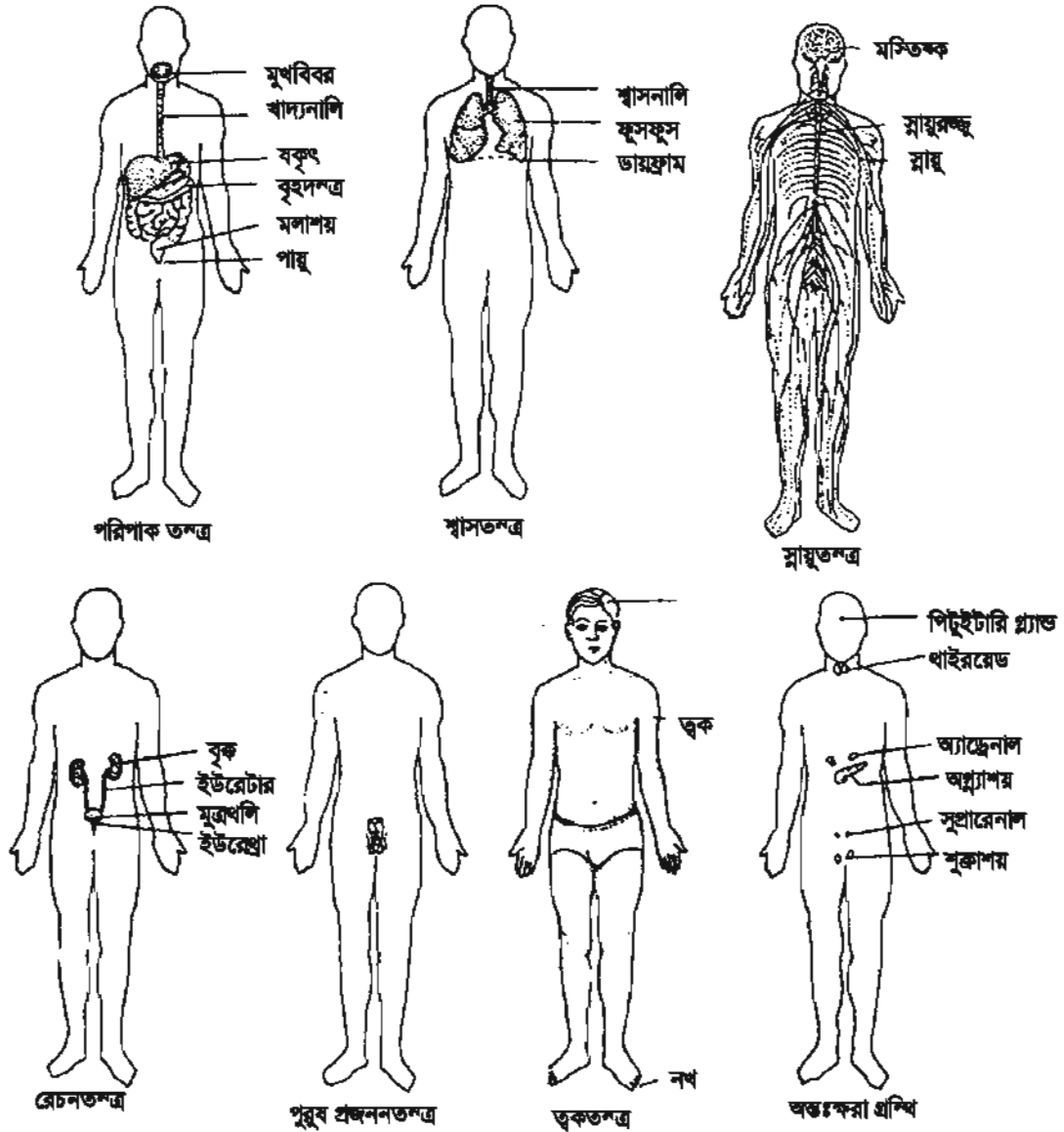


চিত্র ২.২৩ : একটি নিউরন

অঙ্গ ও তন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সক্ষম প্রাণী দেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং উক্ত অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Anatomy) বলে।

অবস্থানভেদে মানবদেহে দু'ধরনের অঙ্গ আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হাত, পা, মাথা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গসমূহ। বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (External morphology) বলে। আর জীবদেহের অভ্যন্তরের অঙ্গসমূহ সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয় তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal anatomy) বলে। পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লিহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ইত্যাদি মানব দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের অংশ।



চিত্র ২.২৪ : মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সরল চিত্র

পরিপাক, শ্বসন, রেনচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেয়া হলো।

পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) : এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যের নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক পরিপাকগ্রন্থি (digestive glands)। পৌষ্টিক নালি মুখছিদ্র, মুখগহবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে গঠিত। মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃত এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) : মানুষের নাসারস্র, গলবিল, ল্যারিঙ্গ, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্যকে পরিবেশ থেকে গৃহীত

অক্সিজেনের সাহায্যে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system) : দেহের বাহিরের ও ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিকা স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

রোচনতন্ত্র (Excretory system) : দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহে উপজাত দ্রব্য হিসেবে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর যা দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার এ পদ্ধতিকে রোচন প্রক্রিয়া বলে। রোচন প্রক্রিয়া যে তন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হয় তাকে রোচনতন্ত্র বলে। একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটর, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি নিয়ে মানুষের রোচনতন্ত্র গঠিত।

জননতন্ত্র (Reproductive system) : প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বক) তৈরি করা ছাড়াও ভ্রূণ ও শিশু ধারক অংশ নিয়ে গঠিত। সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীর প্রজনন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং স্ত্রীলোকের দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বিদ্যমান।

ত্বক তন্ত্র (Integumentary system) : দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিগত ত্বক এই দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine glands) : প্রাণী দেহে কতকগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধুমাত্র রক্তের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে হরমোন পরিবহন করে। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ল্যাণ্ডের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যোম্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতিরবিজ্ঞানীর কাছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তেমনি জীববিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য গবেষণা সহায়ক উপকরণ। এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তোমাদের বিদ্যালয়ে যে বৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে তাতে আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দু'ধরনের। যথা— সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও জটিল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

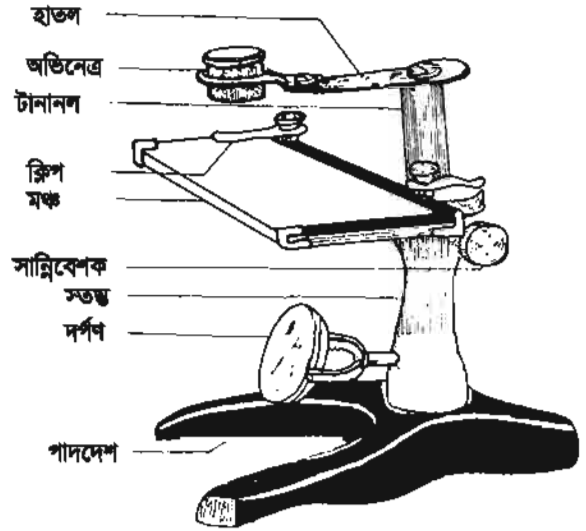
সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র : এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে। এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে। স্তম্ভের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে। স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহুতে লেন্স ধরে রাখার জন্য আঁটা থাকে। এই আঁটায় লেন্স বসিয়ে স্থূল এডজাস্টমেন্ট

স্ক্রু ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তু উপর ফোকাস করা যাবে। প্রয়োজনে আয়না দিয়ে আলো দ্রষ্টব্য বস্তুতে প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে সেটিকে পাদদেশ বলে।

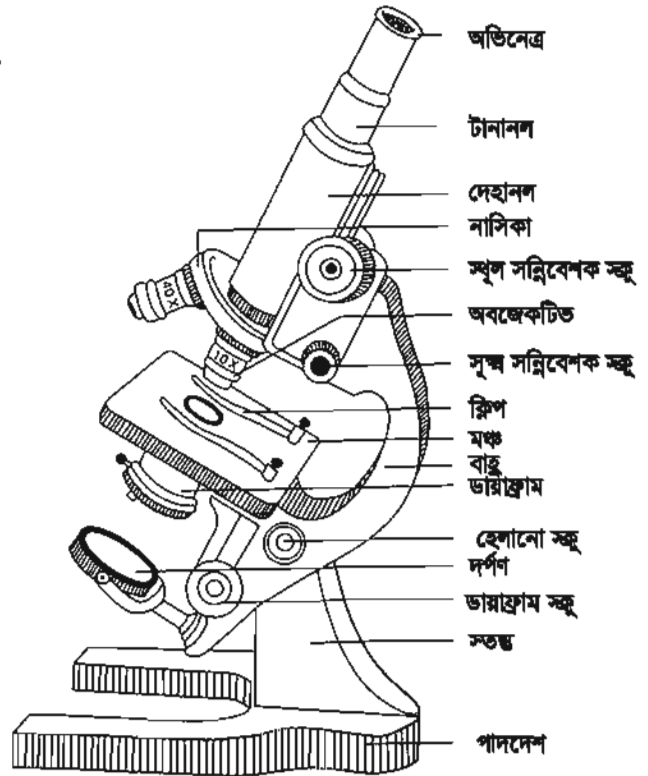
বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেওয়া ভালো। পাশের চিত্রটি লক্ষ কর। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে পাদদেশ বা ফুট বলে। এর দুটি শাখা সামনের দিকে প্রসারিত থাকায় যন্ত্রটি দৃঢ়ভাবে টেবিলের উপর স্থাপন করা যায়। এর সাথে প্রসারিত দুটির মধ্যখানে একটি আয়না লাগানো থাকে। ফুটের উপর স্ক্রু দিয়ে বাকানো অর্ধবৃত্তাকার ধাতব দেহ থাকে। এর নিচের অংশে একটি মঞ্চ বা স্টেজ লাগানো থাকে। চৌকোনাকার স্টেজের মধ্যখানে একটি বড় ছিদ্র ও উপরে দুপাশে দুটি ক্লিপ থাকে। এই ছিদ্রের নিচে কখনও কন্ডেনসার থাকতে পারে। দেহের উপরের বাকানো অংশের সাথে একটি লম্বা নল লাগানো থাকে। একে দেহনল এবং বাকা অংশকে বাহু বলে। ফুটের উঁচু যে অংশের সাথে বাহুটি স্ক্রু দ্বারা লাগানো থাকে তাকে স্তম্ভ বলে। দেহনলের উপরে টানা নল বা ড্র টিউব থাকে যার অভ্যন্তরে আইপিস লেন্সটি প্রবেশ করানো হয়। এখানে চোখ রাখতে হয়। দেহনল বাহুর সাথে লাগানো থাকে। দুটো এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু দ্বারা দেহনলকে উপরে নিচে উঠানো করা যায়। দেহনলের নিচে ঘূর্ণায়মান নোসপিস লাগানো থাকে। এতে কয়েকটি লেন্স সংযুক্ত থাকে। স্থান পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় লেন্সটি স্লাইডের উপর স্থাপন করা যায়।

বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। প্রথমেই আয়নাটি নাড়িয়ে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর স্থাপিত কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোসপিস ঘুরিয়ে নিম্ন পাওয়ারের লেন্স স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে। এবার প্রথমে স্থূল এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে সূক্ষ্ম এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে।



চিত্র-২.২৫: একটি সরল অণুবীক্ষণযন্ত্র।



চিত্র-২.২৬: একটি বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণযন্ত্র

এবার টানা নলে স্থাপিত আইপিস লেন্সে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে সূক্ষ্ম এ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে। দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এক চোখে অণুবীক্ষণযন্ত্র দেখলে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি উচ্চ পাওয়ারের দরকার হয় তবে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নোসপিস ঘুরিয়ে উচ্চ পাওয়ারের লেন্স স্থাপন করতে হবে।

কাজ-১ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ কোষ (পেঁয়াজ কোষ) পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপাদান : পেঁয়াজ, ব্লেন্ড, ক্লাইড, কভার স্লিপ, ওয়াচ গ্লাস, তুলি, গ্লিসারিন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি : পেঁয়াজ থেকে শুকনো খোসাগুলো ছাড়িয়ে নাও। এবার যে কোনো একটি স্ফীত, রসালো শঙ্কপত্র নাও। ব্লেন্ড দিয়ে শঙ্কপত্রের উপরিভাগ থেকে সামান্য ত্বকস্তর তুলে নিয়ে ওয়াচ গ্লাসে রক্ষিত পানিতে রাখ। তুলির সাহায্যে ওয়াচ গ্লাসের পানি থেকে ত্বকস্তর তুলে নিয়ে একটি পরিষ্কার ক্লাইডের উপর রাখ। এবার ত্বক স্তরের উপর এক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে কভার স্লিপ রাখ।

পর্যবেক্ষণ : যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখ। আয়তাকার, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ দেখতে পাবে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখ। প্রতিটি কোষে পাতলা, দানায়ুক্ত প্রোটোপ্লাজম, কোষ গহ্বর এবং একপাশে একটি নিউক্লিয়াস দেখতে পাবে।

কাজ-২ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণিকোষ (অ্যামিবা) পর্যবেক্ষণ কর।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : অণুবীক্ষণ যন্ত্র, ক্লাইড, কভার স্লিপ, ড্রপার, পেট্রিডিস, পিপেট, কাচের দণ্ড, কাচের বাটি ও পানি।

পদ্ধতি : কাজের শুরুতে কোনো পচা ডোবা বা পুকুরের তলদেশ থেকে ডালপালাসহ পচাপাতা সংগ্রহ কর। এগুলো ছোট করে কেটে কাচের বাটিতে রেখে অল্প পানিসহ কাচের দণ্ড দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়তে থাক। এভাবে কিছুক্ষণ নেড়ে বাটিটিকে একস্থানে স্থিরভাবে রেখে দাও। কাচপাত্রে তলানি জমলে একটি পিপেট দিয়ে ঐ তলানি তুলে পেট্রিডিসে জমা কর। এবার ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা তলানি কাচের ক্লাইডে তুলে কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দেওয়ার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে স্থাপন কর।

পর্যবেক্ষণ : ক্লাইড একটু এদিক সেদিক করে খোঁজাখুঁজি করলেই স্বচ্ছ জেলির ন্যায় কতগুলো ক্ষুদ্র জীব দেখতে পাবে। এগুলোই অ্যামিবা। এতে বহু ক্ষণপদ ও গহ্বর দেখতে পাবে এবং কোষটিকে বেস্টন করে প্লাজমালেমা নামক একটি পর্দা দেখতে পাবে। এতে উদ্ভিদ কোষের মতো কোনো প্লাস্টিড থাকে না। উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা গেল কি? এবার যা যা দেখলে তার চিত্র খাতায় ঐকে চিহ্নিত কর।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোষ কাকে বলে?
২. প্লাস্টিডের কাজগুলো কী কী?
৩. টিস্যু ও অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।
৪. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির গুরুত্ব কী?
৫. কোষের শক্তির কাকে বলে?
৬. রক্তের কাজ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন বর্ণনা কর।
২. বিভিন্ন প্রকার সরল কলার গঠন ও কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর।
৩. বিভিন্ন প্রকার প্রাণীকলার গঠন ও কাজ আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লাইসোজোমের কাজ কোনটি?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. খাদ্য তৈরি | খ. শক্তি উৎপাদন |
| গ. জীবাণুভক্ষণ | ঘ. আমিষ সংশ্লেষণ |

২. অ্যামিবা একটি প্রাণিকোষ কারণ এর—

- i. কেন্দ্রিকার গঠন সুসম্পূর্ণ
- ii. বর্ণ গঠনকারী অঙ্গ আছে
- iii. কোষ ঝিল্লী দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রোহিত গ্রামের বাড়িতে যাবার সময় দেখল একজন লোক পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে।

৩. উদ্দীপকের সংগৃহীত অংশটিতে কোন ধরনের টিস্যু বিদ্যমান?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. প্যারেনকাইমা | খ. কোলেনকাইমা |
| গ. ক্লোরেনকাইমা | ঘ. স্ক্লেরেনকাইমা |

৪. উদ্ভীপকের সংগৃহীত অংশের টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- i. কোষপ্রাচীর লিগনিনযুক্ত
- ii. কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব অসমান
- iii. কোষে প্রোটোপ্লাজম অনুপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

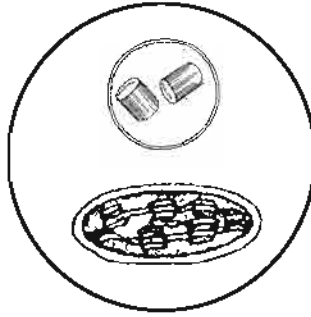
খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.



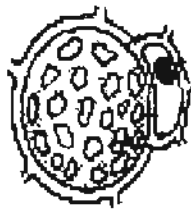
ক. প্রাজমালামা কী?

খ. প্রাস্টিডকে বর্ণগঠনকারী অঙ্গা বলা হয় কেন?

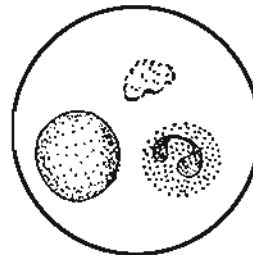
গ. জীবজগতের জন্য N চিহ্নিত অংশটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. M চিহ্নিত অংশটির অনুপস্থিতিতে জীবদেহে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিবে তা বিশ্লেষণ কর।

২.



চিত্র- A



চিত্র- B

ক. পেশি টিস্যু কী?

খ. স্কেলিটাল টিস্যু কীভাবে মস্টিস্ককে রক্ষা করে?

গ. চিত্রের Q চিহ্নিত অংশটির ঐক্য অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্র A ও B -এর মধ্যে একটি পরিবহন কাজ ছাড়াও অন্যান্য জৈবিক কাজে কীভাবে ভূমিকা রাখে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।